بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বই নং ৩৪। www.motaher21.net

بِالْحِكْمَةِ

"জ্ঞান-বুদ্ধি "

" Wisdom"

ادْعُ إِلٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجٰدِلْهُم بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

জ্ঞান-বুদ্ধি আর উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তুমি (মানুষকে) তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান জানাও আর লোকেদের সাথে বিতর্ক কর এমন পন্থায় যা অতি উত্তম। তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে গুমরাহ হয়ে গেছে। আর কে সঠিক পথে আছে তাও তিনি বেশি জানেন।

[১] (دعوة) এর শাব্দিক অর্থ ডাকা, আমন্ত্রণ জানানো, আহবান করা। নবীগণের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে মানবজাতিকে আল্লাহর দিকে আহবান করা। এরপর নবী ও রাসূলগণের সমস্ত শিক্ষা হচ্ছে এ দাওয়াতেরই ব্যাখ্যা। কুরআনুল কারীমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিশেষ পদবী হচ্ছে- আল্লাহর দিকে আহবানকারী হওয়া। এক আয়াতে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে-

(وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا)

[আল-আহযাবঃ ৪৬] এবং অন্য এক আয়াতে আরো বলা হয়েছে-

(يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ)

[আল-আহকাফঃ ৩১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পদাংক অনুসরণ করে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া উম্মতের উপরও ফরয করা হয়েছে। কুরআনুল কারীমে এ সম্বন্ধে বলা

(وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)

অর্থাৎ “তোমাদের মধ্যে একটি দল এমন থাকা উচিত, যারা মানুষকে কল্যাণের প্রতি দাওয়াত দেবে (অর্থাৎ) সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজের নিষেধ করবে।" [আলে-ইমরানঃ ১০৪] অন্য আয়াতে আছে-

(وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ)

-অর্থাৎ "কথা-বার্তার দিক দিয়ে সে ব্যক্তির চাইতে উত্তম কে হবে, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়?” [ফুসসিলাতঃ ৩৩]

উক্ত আয়াতে ইসলাম প্রচার ও তাবলীগের মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। তা হল মানুষকে দীনের দিকে আহ্বান করতে হবে হিকমত দ্বারা এবং সদুপদেশের মাধ্যমে। এখানে হিকমত বলতে ঐ পদ্ধতিকে বুঝানো হয়েছে, স্থান-কাল-পাত্রভেদে যে পদ্ধতি অবলম্বন করলে মানুষের বুঝতে সুবিধা হবে এবং উপযোগী হয়। আর তা হতে হবে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে। ঐ দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে যদি তর্কও করতে হয় তাহলে তা হতে হবে সদ্ভাবে। কর্কশ ও রূঢ় স্বভাবের হওয়া চলবে না।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(وَلَا تُجَادِلُوْٓا أَهْلَ الْكِتٰبِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ)

“তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সাথে বিতর্ক কর না।” (সূরা আনকাবুত ২৯:৪৬)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন যে,

(فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشٰي)

‘তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।’ (সূরা ত্বা-হা-২০:৪৪)

তবে দাওয়াতকে উপক্ষো করে যদি মুসলিমদের ওপর হামলা করে তাহলে তাদেরকে সেভাবেই জবাব দিতে হবে যেভাবে নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিয়েছেন।

সুতরাং হে নাবী! দাওয়াতী কাজ উল্লিখিত নীতি অনুসারে চালিয়ে যাও, কে সুপথ পাবে আর কে পথ ভ্রষ্ট হবে তা আল্লাহ তা‘আলাই ভাল জানেন। তবে পথভ্রষ্ট ও মিথ্যুকদের অনুসরণ করা যাবে না।

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ ص وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ - فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ)

“তোমার প্রতিপালক ভালভাবে জানেন যে, কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি তাদের সম্পর্কেও ভাল জানেন যারা হেদায়েত প্রাপ্ত। অতএব তুমি মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অনুসরণ কর না।” (সূরা ক্বালাম ৬৮:৭-৮)

[২] হেকমত’ শব্দটি কুরআনুল কারীমে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এস্থলে কোন কোন মুফাসসির হেকমতের অর্থ নিয়েছেন কুরআন, কেউ কেউ বলেছেন, কুরআন ও সুন্নাহ। [তাবারী] আবার কেউ কেউ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ স্থির করেছেন। [ফাতহুল কাদীর] আবার কোন কোন মুফাসসিরের মতে বিশুদ্ধ ও মজবুত সহীহ কথাকে হেকমত বলা হয়। [ফাতহুল কাদীর]

অর্থাৎ দাওয়াত দেবার সময় দু’টি জিনিসের প্রতি নজর রাখতে হবে। এক, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং দুই, সদুপদেশ।

জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার মানে হচ্ছে, নির্বোধদের মত চোখ বন্ধ করে দাওয়াত প্রচার করবে না। বরং বুদ্ধি খাটিয়ে যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তার মন-মানস, যোগ্যতা ও অবস্থার প্রতি নজর রেখে এবং এ সঙ্গে পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝে কথা বলতে হবে। একই লাঠি দিয়ে সবাইকে তাড়িয়ে নেয়া যাবে না। যে কোন যুক্তি বা দলের মুখোমুখি হলে প্রথমে তার রোগ নির্ণয় করতে হবে তারপর এমন যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তার রোগ নিরসনের চেষ্টা করতে হবে যা তার মন-মস্তিষ্কের গভীরে প্রবেশ করে তার রোগের শিকড় উপড়ে ফেলতে পারে।

সদুপদেশের দুই অর্থ হয়। এক, যাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে তাকে শুধুমাত্র যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তৃপ্ত করে দিয়ে ক্ষান্ত হলে চলবে না বরং তার আবেগ-অনুভূতির প্রতিও আবেদন জানাতে হবে। দুষ্কৃতি ও ভ্রষ্টতাকে শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে বাতিল করলে হবে না বরং সেগুলোর অশুভ পরিণতির ভয় দেখাতে হবে। ইসলামের

দীক্ষা গ্রহণ ও সৎকাজে আত্মনিয়োগ শুধু যে ন্যায়সঙ্গত ও মহৎ গুণ, তা যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করলে চলবে না বরং সেগুলোর প্রতি আকর্ষণও সৃষ্টি করতে হবে। দুই, উপদেশ এমনভাবে দিতে হবে যাতে আন্তরিকতা ও মঙ্গলাকাংখা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যাকে উপদেশ দান করা হচ্ছে সে যেন একথা মনে না করে যে, উপদেশদাতা তাকে তাচ্ছিল্য করছে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির স্বাদ নিচ্ছে। বরং সে অনুভব করবে উপদেশদাতার মনে তার সংশোধনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং আসলে সে তার ভাল চায়।

অর্থাৎ এটি যেন নিছক বিতর্ক, বুদ্ধির লড়াই ও মানসিক ব্যায়াম পর্যায়ের না হয়। এ আলোচনায় পেঁচিয়ে কথা বলা, মিথ্যা দোষারোপ ও রূঢ় বাক্যবাণে বিদ্ধ করার প্রবণতা যেন না থাকে। প্রতিপক্ষকে চুপ করিয়ে দিয়ে নিজের গলাবাজী করে যেতে থাকা এর উদ্দেশ্য হবে না। বরং এ বিতর্ক আলোচনায় মধুর বাক্য ব্যবহার করতে হবে। উন্নত পর্যায়ের ভদ্র আচরণ করতে হবে। যুক্তি প্রমাণ হতে হবে ন্যায়সঙ্গত ও হৃদয়গ্রাহী। যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে তার মনে যেন জিদ, একগুঁয়েমী এবং কথার প্যাঁচ সৃষ্টি হবার অবকাশ না দেখা দেয়। সোজাসুজি তাকে কথা বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে এবং যখন মনে হবে যে, সে কূটতর্কে লিপ্ত হতে চাচ্ছে তখনই তাকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দিতে হবে যাতে ভ্রষ্টতার নোংরা কাদামাটি সে নিজের গায়ে আরো বেশী করে মেখে নিতে পারে।

[৩]

(وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) -

موعظة-وعظ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন শুভেচ্ছামূলক কথা এমনভাবে বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্য নরম হয়ে যায় [ফাতহুল কাদীর] উদাহরণতঃ তার কাছে কবুল করার সওয়াব ও উপকারিতা এবং কবুল না করার শাস্তি ও অপকারিতা বর্ণনা কর। [ইবন কাসীর] (الْحَسَنَةِ) -এর অর্থ বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের অন্তর নিশ্চিত হয়ে যায়, সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে, এতে আপনার কোন স্বার্থ নেই- শুধু তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলেছেন। (موعظة) -শব্দ দ্বারা শুভেচ্ছামূলক কথা কার্যকর ভঙ্গিতে বলার বিষয়টি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু শুভেচ্ছামূলক কথা মাঝে মাঝে মর্মবিদারক ভঙ্গিতে কিংবা এমনভাবে বলা হয় যে, প্রতিপক্ষ অপমান বোধ করে। এ পন্থা পরিত্যাগ করার জন্য (حسنة) শব্দটি সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ দাওয়াত দেবার সময় দুটি জিনিসের প্রতি নজর রাখতে হবে। এক, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং দুই সদুপদেশ। এ দুটিই মূলত: দাওয়াতের পদ্ধতি। কিন্তু কখনও কখনও দায়ী-র বিপক্ষকে যুক্তি-তর্কে নামাতে হয়। তাই কিভাবে সেটা করতে হবে তাও জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। [ফাতহুল কাদীর]

[৪] (وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ)

جادل শব্দটি (مجادلة) ধাতু থেকে উদ্ভুত। (আরবি) তর্ক-বিতর্ক বোঝানো হয়েছে। (بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ) -এর অর্থ এই যে, যদি দাওয়াতের কাজে কোথাও তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তর্ক-বিতর্কও উত্তম পন্থায় হওয়া দরকার। উত্তম পন্থার মানে এই যে, কথাবার্তায় নম্রতা ও কমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। কুরআনুল কারীমের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক শুধু মুসলিমদের সাথেই সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং আহলে কিতাব সম্পর্কে বিশেষভাবে কুরআন বলে যে,

(وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ)

[আল-আনকাবূতঃ ৪৬] -অন্য আয়াতে মূসা ও হারুন আলাইহিস সালাম-কে

(فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا)

by

[ত্বাহাঃ ৪৪] নির্দেশ দিয়ে আরো বলা হয়েছে যে, ফিরআওনের মত অবাধ্য কাফেরের সাথেও নম্র আচরণ করা উচিত।

قُمْ فَأَنذِرْ

ওঠ, সতর্ক কর।

[১] এখানে সর্বপ্রথম নির্দেশ হচ্ছে, قُم অর্থাৎ উঠুন। এর আক্ষরিক অর্থ 'দাঁড়ান'ও হতে পারে। অর্থাৎ আপনি বস্ত্রাচ্ছাদন পরিত্যাগ করে দন্ডায়মান হোন। এখানে কাজের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার অর্থ নেয়াও অবান্তর নয়। উদ্দেশ্য এই যে, এখন আপনি সাহস করে জনশুদ্ধির দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন। أنذر শব্দটি إنذار থেকে উদ্ভুত অর্থ সতর্ক করা। এখানে মক্কার কাফেরদেরকে সতর্ক করতে বলা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।

((قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ)

“বল : ‘এটাই আমার পথ, আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি আহ্বান করি সজ্ঞানে ও দলীল-প্রমাণের সাথে আমি এবং আমার অনুসারীগণও। আল্লাহ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।” (সূরা ইউসুফ ১২ : ১০৮)

يَٰٓأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَٰفِرِينَ

হে রাসূল! আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন; যদি না করেন তবে তো আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না [১]। আর আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন [২]। নিশ্চয় আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।

[১] এ আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রচারকার্যের তাগিদ ও তার প্রতি সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে, যাতে করে তিনি নিরাশ কিংবা প্রচারকার্যে নিরুৎসাহিত না হন। বলা হচ্ছে যে, আপনার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা সম্পূর্ণটিই বিনা দ্বিধায় মানুষের কাছে পৌঁছে দিন; কেউ মন্দ বলুক অথবা ভাল, বিরোধিতা করুক কিংবা গ্রহণ করুক। অপরদিকে তাকে এ সংবাদ দিয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, প্রচারকার্যে কাফেররা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা’আলা স্বয়ং আপনার দেখাশুনা করবেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যদি আপনি আল্লাহ্ তা’আলার একটি নির্দেশও পৌঁছাতে বাকী রাখেন, তবে আপনি নবুয়তের দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ পাবেন না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন এ কর্তব্য পালনে পূর্ণ সাহসিকতা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। বিদায় হজে তিনি সাহাবায়ে কেরামের অভূতপূর্ব সমাবেশকে লক্ষ্য করে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করার পর প্রশ্ন করলেনঃ ‘শুন, আমি কি তোমাদের কাছে দ্বীন পৌঁছে দিয়েছি?’ সাহাবীগণ স্বীকার করলেন, “জী হ্যাঁ, অবশ্যই পৌঁছে দিয়েছেন।’ এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষী থেকো। তিনি আরো বললেন, ‘এ সমাবেশে যারা উপস্থিত আছ, তারা আমার কথাটি অনুপস্থিতদের কাছে পৌছে দেবে।’ [বুখারী ৪১৪১, ৩২৬৬]

অন্য এক হাদীসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, যে ব্যক্তি মনে করে যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যা কিছু নাযিল হয়েছে তিনি তার কিছু অংশ গোপন করেছেন, সে মিথ্যা বলেছে। [বুখারী ৪৬১২]

আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াত ও অনুরূপ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলের দায়িত্ব শুধু প্রচার করা। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দায়িত্ব যথাযথই পালন করেছেন। এ জন্যে আল্লাহ বলেন, “কাজেই আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন, এতে আপনি তিরস্কৃত হবেন না”। [সূরা আয-যারিয়াত: ৫৪]

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। কোন কিছুই গোপন করেন নি। [আদওয়াউল বায়ান] হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, যে কেউ তোমাকে বলবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে তার কোন অংশ গোপন করেছেন, তাহলে মিথ্যা বলেছে। কারণ, আল্লাহ বলেন, “হে রাসূল! আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন; যদি না করেন তবে তো আপনি তার বার্তা প্রচার করলেন না”। [বুখারী: ৪৬১২]

[২] আয়াতের এ বাক্যে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, যে যত বিরোধিতাই করুক, শত্রুরা আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। হাদীসে বলা হয়েছে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে কয়েকজন সাহাবী দেহরক্ষী হিসাবে সাধারণভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকতেন এবং গৃহে ও প্রবাসে তাকে প্রহরা দিতেন। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি সবাইকে বিদায় করে দেন। [দেখুন- তিরমিযী, ৩০৪৬]

কারণ, এ দায়িত্ব আল্লাহ্ তা’আলা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর প্রচারকার্যে কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি। অবশ্য যুদ্ধ ও জিহাদে সাময়িকভাবে কোনরূপ কষ্ট পাওয়া এর পরিপন্থী নয়। তাছাড়া কোন কোন হাদীসে এ হিফাযতের বাস্তব নমূনাও আমরা দেখতে পাই। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে নাজদের পথে যুদ্ধে বের হলাম। একটি ঘন বৃক্ষ সম্পন্ন উপত্যকায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার তরবারটি একটি গাছের সাথে ঝুলিয়ে রেখে আরাম করছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম ছায়ার আশায় বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত ঘুরাফেরা করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, একটি লোক এসে আমার ঘুমন্ত অবস্থার সুযোগে আমার তরবারটি হাতে নিল। আমি জাগ্রত হয়ে দেখলাম যে, লোকটি আমার মাথার উপর উন্মুক্ত অসি নিয়ে বলছে, তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ। লোকটি দ্বিতীয়বার আমাকে বলল, তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ। আর তখনি তরবারী পড়ে গেল। আর সে হচ্ছে এই বসা লোকটি। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কিছু করলেন না। [মুসলিম:৮৪৩; অনুরূপ বুখারী: ২৯১০]

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايٰتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَادْعُ إِلٰى رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

তোমার প্রতি আল্লাহর আয়াত নাযিল হওয়ার পর তারা যেন তোমাকে তাথেকে কক্ষনো বিমুখ না করতে পারে। তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহবান জানাও, আর কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

উক্ত আয়াতে মূলত আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সান্ত্বনা প্রদান করছেন এবং তাবলীগী কাজে অবিচল থাকার প্রতি জোর দিচ্ছেন। সূরার শুরুতে মূসা (عليه السلام) ও তাঁর শত্র" ফির'আউনের ঘটনা বিস্তারিত আলোচনা করার পর সূরার শেষে নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে চাচ্ছেনন মূসা (عليه السلام)-কে ফির'আউন ও তার বাহিনী হত্যা করতে চেয়েছিল, তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে এবং তার ওপর অমানবিক নির্যাতন করে। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে ফির'আউনের ওপর বিজয় দান করেন এবং নিজ দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অনুরূপ হে রাসূল! মক্কার কাফিররা তোমাকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে, তোমাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে এবং অমানবিক নির্যাতন করেছে। আল্লাহ তাঁর রীতি অনুযায়ী তোমাকেও বিজয় দান করবেন এবং মক্কায় তোমার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন।

(إِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ)

অর্থাৎ যে পবিত্র সত্তা তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করে বিধি-বিধান দিয়েছেন সে সত্তা তোমাকে 'মাআদে' ফিরিয়ে আনবেন। ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন:

(لَرَآدُّكَ إِلٰي مَعَادٍ)

অর্থাৎ মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। (সহীহ বুখারী হা: ৪৭৭৩) অধিকাংশ মুফাসসিরগণ এ কথাই বলেছেন। (তাফসীর কুরতুবী, মুয়াসসার) তবে আল্লামা সাদী বলেন: যে আল্লাহ তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করে বিধি-বিধান দিয়েছেন। যথা হালাল-হারাম বর্ণনা করে দিয়েছেন ও তোমাকে দাওয়াতী কাজের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর হিকমতের শানে এটা উপযোগী নয় যে, ভাল-মন্দ কর্মের প্রতিদান না দিয়ে দুনিয়ার জীবনের মাঝেই সব শেষ করে দেবেন। বরং অবশ্যই তোমাকে আখিরাতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। তথায় ভাল কাজের উত্তম প্রতিদান দেবেন আর মন্দ কর্মের উপযুক্ত শাস্তি দেবেন। (তাফসীর সাদী)

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম যে আল্লাহর দিকে আহবান জানায় এবং সৎকাজ করে। আর বলে, 'অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত

[১] এটা মুমিনদের দ্বিতীয় অবস্থা। তারা কেবল নিজেদের ঈমান ও আমল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না, বরং অপরকেও দাওয়াত দেয়। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? মুমিনদের সান্ত্বনা দেয়া এবং মনোবল সৃষ্টির পর এখন তাদেরকে তাদের আসল কাজের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে। আগের আয়াতে তাদের বলা হয়েছিলো, আল্লাহর বন্দেগীর ওপর দৃঢ়পদ হওয়া এবং এই পথ গ্রহণ করার পর পুনরায় তা থেকে বিচ্যুত না হওয়াটাই এমন একটা মৌলিক নেকী যা মানুষকে ফেরেশতার বন্ধু এবং জান্নাতের উপযুক্ত বানায়। এখন তাদের বলা হচ্ছে, এর পরবর্তী স্তর হচ্ছে, তোমরা নিজে নেক কাজ করো, অন্যদেরকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে ডাকো এবং ইসলামের ঘোষণা দেয়াই যেখানে নিজের জন্য বিপদাপদ ও দুঃখ-মুসিবতকে আহবান জানানোর শামিল এমন কঠিন পরিবেশেও দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে: আমি মুসলিম। মানুষের জন্য এর চেয়ে উচ্চস্তর আর নেই। কিন্তু আমি মুসলিম বলে কোন ব্যক্তির ঘোষণা করা, পরিণামের পরোয়া না করে সৃষ্টিকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে আহ্বান জানানো এবং কেউ যাতে ইসলাম ও তার ঝাণ্ডাবাহীদের দোষারোপ ও নিন্দাবাদ করার সুযোগ না পায় এ কাজ করতে গিয়ে নিজের তৎপরতাকে সেভাবে পবিত্র রাখা হচ্ছে পূর্ণ মাত্রার নেকী। এ থেকে বোঝা গেল যে, মানুষের সেই কথাই সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট যাতে অপরকে সত্যের দাওয়াত দেয়া হয়। এতে মুখে, কলমে, অন্য কোনভাবে সর্বপ্রকার দাওয়াতই শামিল রয়েছে। আযানদাতাও এতে দাখিল আছে। কেননা, সে মানুষকে সালাতের দিকে আহ্বান করে। এ কারণেই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আলোচ্য আয়াত মুয়াযযিন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে دَعَآ اِلَى اللهِ বাক্যের পর وَعَمِلَ صَالِحًا বলে আযান-ইকামতের মধ্যস্থলে দুরাকাআত সালাত বোঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আযান ও একমাতের মাঝখানে যে দো'আ হয়, তা প্রত্যাখ্যাত হয় না। [আবু দাউদ: ৫২১]

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَٰتِ وَالْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتَٰبِ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّٰعِنُونَ

নিশ্চয় যারা [১] গোপন করে আমরা যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হেদায়াত নাযিল করেছি, মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পর [২], তাদেরকে আল্লাহ্ লা'নত করেন এবং লা'নতকারীগণও [৩] তাদেরকে লা'নত করেন [৪]।

[১] যারা আল্লাহ্‌র কিতাবের জ্ঞান গোপন করত, তারা ছিল ইয়াহুদী আলেম সম্প্রদায়। তারা সর্বসাধারণ্যে প্রচার করার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনকে একটি সীমিত ধর্মীয় পেশাদার গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। সাধারণ জনগণকে এ জ্ঞান থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। এমনকি এ গোষ্ঠীর লোকগুলো নিজেদের জনপ্রিয়তা অব্যাহত রাখার জন্য ভ্রষ্টতা ও শরীআত বিরোধী কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়তে নিজেদের কথা ও কাজের সাহায্যে অথবা নীরব সমর্থনের মাধ্যমে বৈধতার ছাড়পত্র দান করত। এ আয়াতে এ ধরণের প্রবণতা থেকে মুসলিমদেরকে দূরে থাকার তাকীদ দেয়া হয়েছে।

[২] এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র যে সমস্ত প্রকৃষ্ট হিদায়াত নাযিল হয়েছে, সেগুলো মানুষের কাছে গোপন করা এত কঠিন হারাম ও মহাপাপ, যার জন্য আল্লাহ্ তাআলা নিজেও লা'নত বা অভিসম্পাত করে

থাকেন এবং সমগ্র সৃষ্টিও অভিসম্পাত করে। এতে কয়েকটি বিষয় জানা যায়ঃ এক. যে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার বিশেষ জরুরী, তা গোপন করা হারাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে লোক দ্বীনের কোন বিধানের বিষয় জানা সত্বেও তা জিজ্ঞেস করলে গোপন করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন। [আবু দাউদঃ ৩৬৫৮, ইবনে মাজাহঃ ২৬৬, আহমাদঃ ২/২৬৩]

দুই. ‘জ্ঞানকে গোপন করার’ অভিসম্পাত সে সমস্ত জ্ঞান ও মাসআলা গোপন করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যা কুরআন ও সুন্নাহতে পরিস্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং যার প্রকাশ ও প্রচার করা কর্তব্য। পক্ষান্তরে এমন সূক্ষ্ম ও জটিল মাসআলা সাধারণ্যে প্রকাশ না করাই উত্তম, যাদ্বারা সাধারণ লোকদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। তখন তা জ্ঞানকে গোপন করার হুকুমের আওতায় পড়বে না। উল্লেখিত আয়াতে (مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى) বাক্যের দ্বারাও তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘তোমরা যদি সাধারণ মানুষকে এমনসব হাদীস শোনাও, যা তারা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তবে তাদেরকে ফেত্না ফাসাদেরই সম্মুখীন করবে। [বুখারী, কিতাবুল ইলম, ইমাম মুসলিম, মুকাদ্দিমা]

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে উদ্ধৃত রয়েছে, তিনি বলেছেন, ‘সাধারণ মানুষের সামনে ইলমের শুধু ততটুকু প্রকাশ করবে, যতটুকু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ধারণ করতে পারে। মানুষ আল্লাহ্ ও রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক, তোমরা কি এমন কামনা কর? কারণ, যে কথা তাদের বোধগম্য নয়, তাতে তাদের মনে নানা রকম সন্দেহসংশয় সৃষ্টি হবে এবং তাতে করে তারা আল্লাহ্ ও রাসূলকে অস্বীকারও করে বসতে পারে। [বুখারী, কিতাবুল ইলমঃ ৪৯ নং অধ্যায়]

[৩] যে কাফের কুফর অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে বলে নিশ্চিত নয়, তার প্রতি লা'নত করা বৈধ নয়। আর আমাদের পক্ষে যেহেতু কারো শেষ পরিণতির (মৃত্যুর) নিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোন উপায় নেই, সেহেতু কোন কাফেরের নাম নিয়ে তার প্রতি লা'নত বা অভিসম্পাত করাও জায়েয নয়। বস্তুতঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত কাফেরের নাম উল্লেখ করে লা'নত করেছেন, কুফর অবস্থায় তাদের মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি অবহিত হয়েছিলেন। অবশ্য সাধারণ কাফের ও যালেমদের প্রতি অনির্দিষ্টভাবে লা'নত করা জায়েয। এতে এ কথাও সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, লা'নতের ব্যাপারটি যখন এতই কঠিন ও নাযুক যে, কুফর অবস্থায় মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোন কাফেরের প্রতিও লা'নত করা বৈধ নয়, তখন কোন মুসলিম কিংবা কোন জীব-জন্তুর উপর কেমন করে লা'নত করা যেতে পারে? সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে আমাদের নারী সম্প্রদায় একান্ত গাফলতিতে পড়ে আছে। তারা কথায় কথায় নিজেদের আপনজনদের প্রতিও অভিসম্পাত বা লা'নত বাক্য ব্যবহার করতে থাকে এবং শুধু লা'নত বাক্য ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট হয় না; বরং তার সমার্থক যে সমস্ত শব্দ জানা থাকে সেগুলোও ব্যবহার করতে কসুর করে না। লা'নতের প্রকৃত অর্থ হল, আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। কাজেই কাউকে ‘মরদূদ’, ‘আল্লাহ্র অভিশপ্ত’ প্রভৃতি শব্দে গালি দেয়াও লা'নতেরই সমপর্যায়ভুক্ত। [মা'আরিফুল কুরআন]

[৪] এ আয়াতে কুরআনুল করীম লা'নত বা অভিসম্পাতকারীদের নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেনি। মুফাসসিরগণ বলেন, এভাবে বিষয়টি অনির্ধারিত রাখাতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু ও প্রতিটি সৃষ্টিই তাদের উপর অভিসম্পাত করে থাকে। মুজাহিদ ও আতা রাহিমাহুমাল্লাহ বলেন, এমনকি জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। [সুনান সাঈদ ইবনে মানসূর: ২/৬৩৮, ৬৩৯, বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান: ৫/২৪] কারণ, তাদের অপকর্মের দরুন সেসব সৃষ্টিরও ক্ষতি সাধিত হয়।

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِۦ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَآءَ مَعَهُۥ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ

তুমি কি তোমার প্রতি যা ওয়াহী করা হয়েছে তার কিছু অংশ পরিত্যাগ করতে চাও আর তোমার মন সংকুচিত করতে চাও তাদের এ কথা বলার কারণে যে ‘‘তার কাছে ধনভান্ডার অবতীর্ণ হয় না কেন, কিংবা তার কাছে ফেরেশতা আসে না কেন?’’ তুমি তো কেবল ভয় প্রদর্শনকারী, যাবতীয় কাজ পরিচালনার দায়িত্ব আল্লাহর।

কাফির ও মুশরিকরা নানাভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বিদ্রূপ ও উপহাস করত এবং নবুওয়াতকে অস্বীকার করার পাঁয়তারা খুঁজতো। তারা বলত মুহাম্মাদ যদি সত্য নাবী হতো তাহলে তার সাথে কোন ফেরেশতা আসেনি কেন? অথবা তাকে ধন-সম্পদের ভাণ্ডার দেয়া হল না কেন? যেমন তারা বলত, আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(لَوْلَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا لا أَوْ يُلْقٰٓى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّأْكُلُ مِنْهَا)

“তার কাছে কোন ফেরেশ্তা কেন অবতীর্ণ করা হল না, যে তার সঙ্গে থাকত সতর্ককারীরূপে?’ অথবা তাকে ধনভাণ্ডার দেয়া হয়নি কেন, অথবা তার একটি বাগান নেই কেন, যা হতে সে আহার সংগ্রহ করতে পারে?” (সূরা ফুরকান ২৫:৭-৮)

আল্লাহ তা‘আলা নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সম্বোধন করে বলছেন: কাফির-মুশরিকদের এসব কথার কারণে কি তোমার কাছে যা ওয়াহী করা হয়েছে তার কিয়দাংশ বর্জন করবে? অথবা নিজের মনকে সংকুচিত করে নেবে?

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ)

“আমি অবশ্যই জানি, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়; (সূরা হিজর ১৫:৯৭)

না, তাদের কথায় ওয়াহীর কোন কিছু বর্জন করা যাবে না এবং মনও সংকুচিত করা যাবে না। বরং তোমাকে মনে রাখতে হবে তুমি একজন সতর্ককারী, যাদেরকে সতর্ক করছো তারা অনেক মন্তব্য করতে পারে। তাই বলে মন সংকুচিত করে দাওয়াতী কাজ বর্জন করা যাবে না। তোমার পূর্ববর্তী নাবীদেরকে অনুরূপ উপহাস করা হয়েছিল কিন্তু তারা তাদের কাজ থেকে থেমে থাকেনি। শেষ পর্যন্ত তাদের নিকট আল্লাহ তা‘আলার সাহায্য এসেছিল। আল্লাহ তা‘আলা সব বিষয়ে দায়িত্বশীল, সুতরাং তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও, আল্লাহ তা‘আলা সব ব্যবস্থা করবেন।